অসংকোচ প্রকাশের দুরন্ত সাহস

সমকাল

www.samakal.net

দৈনিক সমকাল, ২০১৯-০৫-২৭, পৃ- ০৮

East West Univ. LIBRARY

ধান-চালের প্রাচুর্য সমস্যা : টেকসই সমাধানই আছে

কৃষি ও কৃষক

মোহাম্মদ ফরাসউদ্দিন

অর্থনীতিবিদ, শিক্ষাবিদ ও সমাজকর্মী

বর্তমান মৌসুমে অনেক কিষাণ-কিষাণির ঘরে উদ্বৃত্ত ধান-চাল। মণপ্রতি ৮৫০ টাকা ধানের উৎপাদন খরচ আর প্রকৃত সংগ্রহমূল্য বা বাজারদর ৪৫০-৫০০ টাকার বেশি নয়। সাধারণভাবে মধ্যস্বত্বভোগী তথা ফড়িয়া ব্যাপারীর সঙ্গে মিল মালিক ও সংশ্লিষ্ট সরকারি কর্মকর্তাদের স্বার্থের গাঁটবন্ধন এ অবস্থার জন্য দায়ী হলেও অন্যান্য কারণও রয়েছে বটে। ১৯৭২ সালে এক কোটি ১০ লাখ টন চাল উৎপাদন হয়েছিল। ২০১৮ সালে হয়েছে তিন কোটি ৮০ লাখ টন চাল। অর্থাৎ এই সময়ে জনসংখ্যা ২.২ গুণ (৭.৫ কোটি বনাম ১৬.৫ কোটি) বৃদ্ধি পেলেও চালের উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে প্রায় ৩.৫ গুণ। মাথাপিছু সম্ভাব্য প্রাপ্তি হয়েছে দ্বিগুণ। আবার বাংলাদেশ ততদিনে অনুন্নত থেকে স্বল্পোন্নত থেকে উন্নয়নশীল দেশে উঠে এসেছে। মানুষের ভোগ কাঠামো পরিবর্তন হয়ে ভাত খাবার প্রবণতা কমেছে। আবার স্বামী-স্ত্রী উভয়েই যেসব পরিবারে উপার্জনে নেমেছেন, সেখানে তথাকথিত 'ফাস্টফুডে' ঝুঁকতে হয়েছে। এসব কারণে ধান-চালের উদ্বৃত্ত বেড়েছে। আবার ধান উৎপাদনে 'কবওয়েব' তত্ত্ব কার্যকর। অর্থাৎ যে বছর ধান-চালের দর পড়ে যায়, তার পরের বছর কৃষককুল উৎপাদন কমিয়ে দেয়। ফলে উৎপাদন-সরবরাহ কমে গিয়ে দাম বাড়ে। পরের বছর আবার বেশি মূল্যের কারণে উৎপাদন বৃদ্ধি পায়।

এটি অনস্বীকার্য যে, ফসল কাটার মৌসুমে উৎপাদনকারীরা বিক্রির চাপে থাকেন। ঋণ শোধ, সামাজিক খরচাদি, বার্ষিক কিছু বিনিয়োগ ইত্যাদি কিষাণ-কিষাণিকে উদ্বৃত্ত বিক্রি করতে বাধ্য করে। একেবারে ধনী কৃষক ছাড়া অন্যদের নেই খাদ্য গুদাম। এই মোক্ষম সুযোগে সংশ্লিষ্ট খাদ্য সংগ্রহকারী সরকারি লোকেরা নানা অজুহাতে (যথা চিটা বেশি, ভিজা ভিজা) কিনতে অনীহা দেখান এবং আশপাশে অবস্থানকারী ফড়িয়া, ব্যাপারী ও মিল মালিকরা ৪৫০-৫০০ টাকা মণে কিনতে অনড় থাকে। সংগ্রহমূল্য ঘোষণা দেরিতে হয়। গুদামজাত করা যায় মাত্র ১৫ লাখ টন, অথচ কৃষকের বিক্রিযোগ্য উদ্বৃত্ত এ বছর অনেক বেশি।

কৃষি খাতে মজুরি : দেশে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির কারণে শিল্প খাত প্রসারিত হয়েছে। বেড়েছে শ্রম চাহিদা। সাধারণভাবে কৃষি শ্রমিকের সংখ্যা কমেছে। আছে এতে 'সিজনেলিটি' অর্থাৎ মৌসুম অনুযায়ী জোগানের হ্রাস-বৃদ্ধি। বর্তমানে গ্রামবাংলায় একজন কৃষিমজুর দৈনিক গড়ে ৭৫০-৮০০ টাকা পারিশ্রমিক নিয়ে থাকেন। আর দুপুরবেলা বিশাল একটি মধ্যাহ্নভোজ। তাই মোটামুটি হিসাবে ধান কাটা মৌসুমে দৈনিক প্রকৃত মজুরি ১৫ কেজি চাল। শুনতে ভালো লাগে এবং শ্রম দানকারীদের জন্য সুখবর। তবে যারা শ্রমিক দিয়ে ধান কাটাতে চান তাদের নাভিশ্বাস। তবে দৈনিক প্রকৃত মজুরি হবে ৭.৫ কেজি চাল। কারণ একজন শ্রমিক অন্তত দুই মণ চাল পাওয়ার মতো যথেষ্ট ধান কাটবেন প্রতিদিন। তবুও হিসাব মেলে না। উৎপাদন খরচ বাজারমূল্যের চেয়ে বেশিই থাকে। গৌণ হলেও উল্লেখ্য, কিষাণ-কিষাণি সম্ভবত সাংবৎসরিক খোরাকির ধানটা হিসাবে আনেন না। তবে আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে, কৃষি উৎপাদনে উপকরণ অর্থাৎ বীজ, সার, সেচ গত ১০ বছরে বিপুল সরকারি ভর্তুকি উৎপাদন খরচ যথেষ্ট পরিমাণে কমাতে সাহায্য করেছে। বাকি থাকে ক্রমবর্ধমান মজুরি, যা অনুপস্থিত জমি মালিকের জন্য এবং মাঝারি ও বড় খামারির জন্য বিরাট সমস্যা।

অভিজ্ঞতা : ধান-চালের দাম নিয়ে কৃষককুলের বিপদে পড়া এই প্রথম নয়। তবে আগে অতিরিক্ত উৎপাদন খরচ একটা বিরাট সমস্যা ছিল। সুদূর অতীতে মোগল আমলে ১৬৬১ ও ১৬৬২ খ্রিষ্টাব্দে ১২৭৬ সনে মারাত্মক দুর্ভিক্ষ-ছিয়াত্তরের মন্বন্তরে বাংলার কত লোকের মৃত্যু ঘটে, তার ইয়ত্তা নেই। ১৬৬৪ সালে শায়েস্তা খাঁ সুবে বাংলার গভর্নর হিসেবে বাংলার মসনদে বসেন মীর জুমলার উত্তরসূরি হিসেবে। সেই আমলে সুবেদারি অতি উচ্চমূল্যে কিনতে হতো এবং শায়েস্তা খাঁ প্রতি বছর কয়েক কোটি টাকা নজরানা পাঠাতেন দিল্লিতে। ফলে ছিয়াত্তরের মন্বন্তর থেকে বাংলার কৃষককুল ঘুরে দাঁড়াতে পারছিলেন না। ধান-চালের উৎপাদন কমে গেলেও বাংলার ধনদৌলত দিল্লিতে পাচার হয়ে যাওয়ার ফলে ক্রেতাসাধারণ নিঃস্ব হয়ে পড়েন। দারুণভাবে হ্রাস পায় ক্রয়ক্ষমতা। এক টাকায় তাই পাওয়া যেত আট মণ চাল। টাকায় আট মণ চালের গল্প তাই গৌরবের নয়; লজ্জা ও হতাশার!

স্বল্পমেয়াদে সরকারি উদ্যোগে সরাসরি ধান কেনার বিষয়টি জোরদার করা জরুরি। মধ্যমেয়াদে ধানি জমিতে অন্যান্য ফসলের চক্রাকার বৃত্ত গড়ে তোলা যায়। অর্থাৎ আগের বছর ধান গাছ যেসব খনিজ জমি থেকে আহরণ করে, সেগুলো পরের বছর জমিতে প্রোথিত করা ফসল ফলানোর চেষ্টা করা যেতে পারে। যেসব ফসলকে 'ক্যাশ ক্রপ' বলা যায়, তার উৎপাদন বাড়াতে গবেষণা করা যায়। আবার 'অফ ফার্ম' কার্যক্রমে গ্রামবাংলায় ধান-চাল ছাড়া অন্যান্য উৎপাদিত পণ্যের প্রক্রিয়াজাতকরণের মতোই চালকে শিল্পজাত পণ্যে পরিণত করার গবেষণা করাও সমাধানের পথে শক্তি যোগ করবে

১৯৯৯-২০০০ অর্থবছরের আগের বছরের দীর্ঘস্থায়ী সর্বনাশা বন্যার ক্ষয়ক্ষতি পুষিয়ে অত্যন্ত শক্তিধর ও বহুমুখী সরকারি সহায়তায় কিষাণ-কিষাণিরা ঘুরে দাঁড়িয়ে চাল উৎপাদনে রেকর্ড করেন। তবুও এক ধরনের অসাধু ব্যবসায়ী একটি প্রভাবশালী মহলকে হাত করে একটি প্রতিবেশী দেশ থেকে চাল আমদানির লাইসেন্স পেয়ে যান। শোনা যায়, চালের মাঝখানে বিপুল পরিমাণ সর্বনাশা মাদক আসতে শুরু করে। সে পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশ ব্যাংক চাল আমদানিতে শতভাগ মার্জিন বসিয়ে আমদানিকৃত চালের দাম অনেক বাড়িয়ে নিয়ে সমস্যার সমাধান করে। বর্তমান অবস্থা বোধ করি আরও ঘোলাটে হয়েছে বড় বড় হোটেলের জন্য মিহি চাল আমদানি করার ভ্রান্ত সিদ্ধান্তে। শুল্ক বৃদ্ধি ছাড়াও চাল আমদানিতে তাৎক্ষণিকভাবে মার্জিন বসানো সমীচীন বলে মনে হয়।

সমাধানের উপায় কী : স্বল্পমেয়াদে সরকারি উদ্যোগে সরাসরি ধান কেনার বিষয়টি জোরদার করা জরুরি। মধ্যমেয়াদে ধানি জমিতে অন্যান্য ফসলের চক্রাকার বৃত্ত গড়ে তোলা যায়। অর্থাৎ আগের বছর ধান গাছ যেসব খনিজ জমি থেকে আহরণ করে, সেগুলো পরের বছর জমিতে প্রোথিত করা ফসল ফলানোর চেষ্টা করা যেতে পারে। যেসব ফসলকে 'ক্যাশ ক্রপ' বলা যায়, তার উৎপাদন বাড়াতে গবেষণা করা যায়। আবার 'অফ ফার্ম' কার্যক্রমে গ্রামবাংলায় ধান-চাল ছাড়া অন্যান্য উৎপাদিত পণ্যের প্রক্রিয়াজাতকরণের মতোই চালকে শিল্পজাত পণ্যে পরিণত করার গবেষণা করাও সমাধানের পথে শক্তি যোগ করবে।

তবে মধ্যস্বত্বভোগীর দাপট কমাতে না পারলে চাষি যেমন ন্যায্যমূল্য পাবে না, ভোক্তাদেরও তেমনি অতিরিক্ত মূল্য গুনতে হবে। সেজন্য মধ্য মেয়াদে শুরু করে দীর্ঘমেয়াদি সমাধান হচ্ছে 'কৃষিপণ্য উৎপাদন ও বিপণন সমিতি' কাঠামো কার্যকরভাবে গড়ে তোলা। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ১৩(খ) অনুচ্ছেদে সম্পত্তির মালিকানার নীতিতে বলা হয়েছে, 'সমবায়ী মালিকানা অর্থাৎ আইনের দ্বারা নির্ধারিত সীমার মধ্যে সমবায়গুলোর সদস্যদের পক্ষে সমবায়গুলোর মালিকানা।' অনেকটা সেই পরিপ্রেক্ষিতে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭৫ সালের ২৫ জানুয়ারি যে দ্বিতীয় বিপ্লবের ডাক দিয়েছিলেন, তার একটি মর্মার্থ এই যে, ছোট-বড় সব রকম জমি খণ্ডেই আইল উঠিয়ে দিয়ে জমি একীভূত (কনসলিডেটেড) করা হবে। এটি সমবায়ের নীতিতে করা হবে। আধুনিক যান্ত্রিক পদ্ধতিতে চাষাবাদের ফলে ফসল উৎপাদন দুই থেকে তিন গুণ হবে এবং জমির চাষকারীরা পূর্বের তুলনায় অন্তত দ্বিগুণ ফসল পাবেন। একটি অংশ যাবে মালিকের কাছে এবং অন্য একটি অংশ রাষ্ট্রের কাছে। তিনি বলেছিলেন, 'ভয় পাবেন না, আমি আপনাদের জমি নিয়ে যাচ্ছি না।' সে কৃষি সমবায় মডেলকে যুগোপযোগী এবং গ্রহণযোগ্য করে ক্ষেতের আইল ভেঙে হোক বা না ভেঙে স্বেচ্ছাপ্রণোদিতভাবে গ্রামবাংলায় ছোট-বড়-মাঝারি ধান উৎপাদন ও বিপণন সমিতি গড়ে তোলা এখন সময়ের প্রয়োজন। সদাশয় সরকারকে অবশ্যই কয়েকটি উদ্যোগ নিতে হবে এবং সুবিধা নিতে হবে। প্রথমত, মজুদ বা স্টোরেজ ক্ষমতা বর্তমানে ১৫ লাখ টন থেকে ক্রমবর্ধমান করা উচিত হবে। সমবায় সমিতিগুলোকে অত্যন্ত সাশ্রয়ী সুদে (শতকরা ৩ থেকে ৪) ঋণ দিলে ওগুলো ধান কাটার মৌসুমে নিজেদের উদ্বৃত্ত নিজেরাই কিনে সরকারি গুদামে নামমাত্র ভাড়ায় মজুদ করবেন। বাজারের অবস্থা বুঝে ওখান থেকে ধান-চাল বিক্রি করে মূল্য স্থিতিশীল রাখবেন সমবায়ী চাষিরা। উৎপাদনকারী এখনকার চেয়ে বেশি দাম পাবেন আবার ভোক্তারা কিনবেন কম দামে। এভাবে শক্তিধর মধ্যস্বত্বভোগী স্বার্থ ভেঙে ফেলা সহজ নয়; তবে রাষ্ট্রের শক্তি অবশ্যই বেশি এবং এটি জনকল্যাণে ব্যবহার করা জরুরি। অতীতে সমবায় পদ্ধতি ব্যর্থ হয়েছে বলে আবার চেষ্টা করা কেন যাবে না? হরিয়ানাসহ ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে এবং বিশ্বের অন্যান্য দেশে তীক্ষ্ণ নজরদারির মধ্যে সমবায় মাধ্যমে সমৃদ্ধি অর্জিত হয়েছে। বাংলাদেশেও তা জোরেশোরে শুরু করা জরুরি।

দীর্ঘমেয়াদি সমাধান : সম্ভবত চূড়ান্ত বিচারে কৃষিতে বাণিজ্যিকীকরণ ঘটে যাবে। ক্ষুদ্র মালিকরা ভূমিহীন হয়ে পড়বে। সে পরিপ্রেক্ষিতে কৃষি শ্রমিক নিয়োগ করা আরও কঠিন হয়ে পড়বে। হয়তো সম্ভব হবে না, তবুও বিবেচনা করা উচিত : কল্যাণ রাষ্ট্রে জমির মালিকানায় সীমারেখা টেনে উদ্বৃত্ত জমি ভূমিহীনদের মধ্যে বিতরণ করা। তারাই নিজেদের জমি চাষবাস করবেন। ভর্তুকি মূল্যে উপাদান পাবেন, শ্রম দেবেন নিজেরা। খরচ কমে যাবে উৎপাদনে।

একটি বিকল্প হতে পারে 'তেভাগা' পদ্ধতি চালু করা। অর্থাৎ জমির মালিক, লাঙলের মালিক ও উপাদান- এই তিনটি অংশে উৎপাদিত ফসলকে ভাগ করে ফেলা। বর্গাচাষি যদি উপাদান দেন, তাহলে সমস্যার অনেকটাই সমাধান হয়ে যাবে। তিনি পাবেন উৎপাদিত ফসলের দুই-তৃতীয়াংশ। তদানীন্তন কৃষিমন্ত্রী আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ খান ১৯৮৭ সালের প্রস্তাবে তেভাগা প্রথার সুপারিশ করেছিলেন। তা ছাড়া বর্গাচাষিকে সুরক্ষা দেওয়ার জন্য শুধু জমির মালিক যদি নিজে চাষ করেন, তাহলেই কেবল বর্গাদারের কাছ থেকে জমি নিয়ে নেওয়া যাবে। চাষযোগ্য জমি কেনাবেচায় বর্গাদার চাষিকে 'রাইট অব প্রিএমপশন'-ক্রেতা অগ্রাধিকার দিতে হবে। যদি একজন বর্গাচাষি বাজারমূল্যে তার লাঙলের নিচে থাকা জমি কিনতে চান, তাহলে তা অন্য কোনো ক্রেতার কাছে আইনত বিক্রি করতে না পারার বিধান করা যেতে পারে। আপাত দৃষ্টিতে এ সংস্কারটি সাধন করতে অনেক বড় বাধা আসতেই পারে। তাই বলে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের কল্যাণ রাষ্ট্রে সবার মুখে সোনার বাংলার হাসি সৃজনে পিছপা হলে তো চলবে না।